# অশ্বমেধের ঘোড়া : স্মৃতিবিস্মৃতির চেয়ে কিছু বেশি

হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

ওরা কাঞ্চন-রেখা। ওদের চোখের সামনে ঘোড়াটা ছুটছে।

তথাকথিত উন্নতি আর প্রগতির অশ্বমেধের ঘোড়া। বিজিত জনপদের মতো পায়ের তলায় মাড়িয়ে যাচ্ছে সূক্ষ্মতা আর সংবেদন, হারিয়ে যাচ্ছে মুগ্ধতা আর অভিমান। নাগরিক সাফল্যের কুহক যেন দুচোখে ঠুলি হয়ে আছে। দিগ্বিজয়ের উল্লসিত হ্রেষায়, তার দুরন্ত গতির পরাক্রমে, হর্ষের হর্সপাওয়ার দীপ্তিতে পুরনো সহজ মানবিক সেন্টিমেন্টগুলি ছিটকে পিছু হটে গেছে কবে! ছুটছে অশ্বমেধের ঘোড়া। সময়-সমাজ-স্বভাবের মিশ্রিত বর্ণের কোলাজ তার শরীরে।

যেন কাচের পৃথিবীর পিচ্ছিল পাটাতনে দাঁড়িয়ে একজন কাঞ্চন দেখছে এইসব, আর ভাবছে, "এই কলকাতা দিন দিন আধুনিক হচ্ছে, বর্বর হচ্ছে, সূক্ষ্মতার নামে দরকচা মেরে যাচ্ছে।" ত্রিমাত্রিক তঞ্চকতার এমন এক বিশ্বে দাঁড়িয়ে একজন রেখা দেখেছে এইসব, আর বলছে, "এত বাণী দিও না মাস্টার মশাই। লোকে ধরে বেঁধে মন্ত্রী বানিয়ে দেবে।" এদের দ্যাখা আর এদের অনুভব-অভিমানটুকু দ্যাখানোর দায়ভার যেন সেধে নিয়েছিলেন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর অসামান্য গল্প 'অশ্বমেধের ঘোড়া'-র অক্ষরে অক্ষরে। কাঞ্চন এবং রেখা সেই গল্পের দুই কেন্দ্রীয় চরিত্র।

জীবনের গল্পগুলিতে সাধারণত যেমন হয়, প্রথমে ওদের বন্ধুত্ব, তারপর প্রেম। তারপর চুপিচুপি বিয়ে। রেজিস্ট্রি। গোপন গেরিলাযুদ্ধের মতো এই বিয়ের শরিকও দুচারজনই মাত্র, সুকুমার, প্রফুল্ল, চন্দন। কারণ বাড়ি মানেনি, সমাজও সম্ভবত না। সইসাবুদ-শেষে প্রতীকী মালাবদলের মালা হাতে চূড়ান্ত অপ্রস্তুত যুগলে বাঘমার্কা ডাবলডেকারে উঠে এবং আর এক প্রস্থ অপ্রস্তুত অবস্থায় নেমে বাস কন্ডাকটারের টিটকিরি শুনতে শুনতে ঠিক যে কলকাতার রাজপথে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেই পথ যেন তাদের হয়েও তাদের নয়। সানাইয়ের সুর, কান্নার স্বাদ আর অসম্মানের গন্ধমাখা সেই রাজপথে মাঙ্গলিক মালাজোড়া অভিমানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওরা দেখেছিল, "একটা স্থবির বলদ সেটি চিবুচ্ছে।"

ওরা, কাঞ্চন আর রেখা। স্বামী-স্ত্রী। অথচ চারপাশের কেউ জানে না ওদের বিয়ের কথা। কারণ একসাথে থাকে না ওরা, থাকেনি একদিনও। "রেখা রুমাল দিয়ে ঘষে ঘষে কপালের সিঁদুর মুছে" ফেলেছিল সেই রেজিস্ট্রির দিনেই। তারপর থেকে শুধুই ভয়। লুকোচুরি। গোটা পৃথিবীর চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা। এবং তারপরও প্রাপ্য আর প্রাপ্তের বাস্তবে দাঁড়ানো দুটি স্পর্শকাতর, অতএব স্পষ্ট কাতর নারীপুরুষের পরস্পর সম্পর্ককে আঁকড়ে ধরে বাঁচার বিচিত্র বারোমাস্যা। সাধারণ বাঙালি মধ্যবিত্তের চেয়ে ঢের বেশি সংবেদনশীল আর কল্পনাপ্রবণ হওয়াটাই যেন কাঞ্চনদের ক্ষেত্রে সত্যিকার সমস্যা। যে নির্বোধ হঠকারিতাকে আমরা সাহস বলি, যে বাচাল চাতুরিকে আমরা সপ্রতিভতা বুঝি, যে বৈষয়িক ধূর্ততাকে আমরা প্র্যাকটিক্যাল হওয়া ভাবি—সেই সবের থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে এরা মাপে

সৌন্দর্য আর স্বপ্নের মতো ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হল, যেন কুৎসিত ক্যাকোফনির মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে সানাইয়ের চন্দ্রকোশ। যেন আসলে ভেঙে যাচ্ছে তাদেরই ঘরবাঁধার স্বপ্নটা। আর সেই নষ্টনীড় বেদনাবেলায় গল্পে তাদের শুধু বারবার দ্যাখা যায় পাশাপাশি হেঁটে যেতে, কিংবা বাসে চেপে গোধূলিমদির শহরের অলিগলি ঘুরে আবার যে যার মতন ডেরায় ফিরে যেতে। সুসভ্য প্রেমিকসুলভ এই শোচনীয় অবদমনই অগত্যা তাদের অনন্যোপায় দাম্পত্য। অথবা, তার শতচ্ছিন্ন ছদ্মবেশ। সুতরাং জয় করে তবু ভয় কিছুতেই যায় না। তবু এই ভীরু প্রেমের মেঘাচ্ছন্ন মন্থর আকাশে ধ্রুবতারাটির মতো বেঁচে থাকে তাদের কমিটমেন্ট। ভালোবাসা।

বড্ড বেশি বুদ্ধিজীবী ওরা। একটু বেশিমাত্রায় পোশাকিও যেন। দিনের পর দিন রাতের পর রাত পারস্পরিক ব্যবধানের দীর্ঘশ্বাস পার হয়ে তাদের দ্যাখা হলেও তারা যতোটা আন্তরিক ততোটাই যেন অ-শরীরী। বহুমূল্য মুহূর্তগুলি শুধু কথায় ভরে রাখে তারা, কুণ্ঠিত হাতে হাত রাখা কিংবা পায়ে পায়ে সতর্ক পথচলা বিনা কতোটুকু উষ্ণতা বিনিময় হয় তাদের? লোকলোচন এড়িয়ে, এই সুবিমলদের মতো পরিচিতের অশালীন কৌতূহল এড়িয়ে চলতে চলতে কতোটুকু উষ্ণতা বাঁচিয়ে রাখাই বা সম্ভব? হয়তো কিছু মর্মান্তিক সত্যকে দুজনেই দুজনের কাছে আড়াল করতে চায় এবং চায় বলেই বৃথা এত কথার ইমারত রচা। হয়তো তাই কাঞ্চন কখনো বা বলেই ফ্যালে "জানো, এই কথার খেলা সত্যি আর ভাল লাগে না।" তবু এমন খেলা চলতে থাকে, চলতেই থাকে। আশেপাশে পড়ে থাকে হেলাফেলা সারা বেলা, আশাহত। এমনি করে বিধিবদ্ধ বেঁচে থাকার ফাঁকেই, কী আশ্চর্য, বছর ঘুরে যায়! ফিরে আসে কাঞ্চন আর রেখার প্রথম বিবাহবার্ষিকী। গল্পের মূল সময়াঙ্ক সেই দিনটাই।

ভয়াবহ বাস্তবের প্রহারে পাংশু এরা দুজন ঠিক করেছিল, একটু আলাদাভাবে কাটাবে দিনটা, একটু বেশি যত্নে, একটু বেশি মর্যাদার সঙ্গে। সহজে লজ্জা পাওয়া অথবা সহজে দুঃখ পাওয়ার ভদ্রলোকি অভ্যেস জলাঞ্জলি না দিয়েও একটু বেশি সময় ঘনিষ্ঠ হয়ে তাদের ব্যক্তিগত বড়ো দিনটাকে বাড়তি একটু মূল্য দিতে চাইলো দুইজনে। স্মৃতিকাতর কাঞ্চন পুরনো সেই দিনের মতো আবার যেন সন্ধ্যার বাতাসে শুনতে পেল চন্দ্রকোশ, সঙ্কোচের বিহ্বলতা ছেড়ে রেখা আবার পথের প্রৌঢ় পসারির থেকে কিনে নিলো ফুলমালা। এবং সেই ব্যতিক্রমী শুক্লপক্ষে হঠাৎ যখন কাঞ্চনের "বেশ একটু মোগলাই মেজাজ হচ্ছে" ওরা দুজনে সাব্যস্ত করলো, আজ যে যার ঘরে ফেরার পথটায় আর বাসযাত্রার জনগণতান্ত্রিক নিয়মে অথবা, ট্যাক্সির বেলেল্লা দ্রুতির ডানায় ভর করে ফিরবে না, ফিরবে সময়কে উপভোগ করতে করতে বেশ আয়েস করে, স্মরণযোগ্যভাবে। কার্যত যা হবে, এমন দিনে, দুজনকে দুজনের দেওয়া সেরা উপহার।

আইডিয়াটা কাঞ্চনের! তারা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে ফিরবে। যেন বা উনিশশতকী বাবুর মতো, অলৌকিক দুলকি চালে, গতিময় নগরের তাৎপর্যহীন ব্যস্ততাকে করুণা করতে করতে! নিজস্ব নির্জনতায়, স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতে মেলামেশা রঙিনতম মুহূর্তগুলি নিজেদের মাঝে ভাগ করে নিয়ে। কারণ তারা তো জানেই গোটা বছরভর কিছুই দিতে পারে নি তারা

নিজেদের, অবশিষ্ট পরিচিত পৃথিবীর থেকে পালিয়েছে শুধু, কারণ তারা তো জানেই :

"ভালো লাগে না। ভালো লাগে না। চুরি করে একটু সময় নেওয়া, দুটো কথা, একপেয়ালা কফি, লম্পট নদীতীরে নির্জনতার ব্যর্থ আকর্ষণ, তারপর অক্ষম ক্লান্তি ও ক্ষোভে অপরিচিতের মতো ঘরে ফিরে যাওয়া। একদিন কোনও এক নিকট অথচ বিস্তৃত অতীতে, সবই ছিল স্বপ্ন। আর আজ, আর এখন, ঘেন্না করে।"

সুতরাং, আজ, এখন, এই বিশেষ স্মরণের সরণিতে দাঁড়িয়ে, ঘৃণা মুছে, নানান মাত্রার অভাব পাশে সরিয়ে ওরা এই সময়টুকুর সম্রাট হতে চেয়েছে, তাই কাঞ্চন চিৎকার করে ডাকে—'গাড়োয়ান রোককে'। তারপর বিস্মিত রেখার অবাক উপস্থিতি এবং নীরব তারিফকে তারিয়ে তারিয়ে গ্রহণ করতে করতে উঠে বসে ফিটনে। ওরা দুজন, কাঞ্চন আর রেখা। এসপ্ল্যানেড থেকে খিদিরপুর—এই নিত্যযাত্রাপথ আজ একটু অচেনার আবহে বর্ণময় হোক, এই ভেবে। সহিস বলে :

"পোলের ওপারভি যাবেন?

না।

গঙ্গার কিনারা দিয়ে?

হ্যাঁ।

চার টাকা লাগবে স্যার।"

এই হতভাগ্য শহরে, এই বর্তমানে, স্বপ্নেরও দরদস্তুর চলে। কংক্রিটের এই জঙ্গলে সাধ আর সাধ্যের মধ্যে চলে নিয়ত টানাপোড়েন। সেই নৈমিত্তিক দড়ি টানাটানির খেলায় অতিস্পর্শকাতর কাঞ্চন সহজে আহত হয়। তার হীনম্মন্যতা ও ব্যর্থ পৌরুষ কখনো কখনো রেখার প্রতি ক্রোধ হয়ে ঝরে। একসময় অশিষ্ট গাড়োয়ানের সঙ্গেও বার্গেনিং শেষ হয় আড়াইটাকায়। ওরা ঘোড়া-গাড়িতে উঠে বসে। কাঞ্চনের "অদ্ভুত আনন্দ" হয়।

"তারপর গাড়ি চলতে শুরু করল। পরপর কতগুলো বাস বাতাসের ঝাপট দিয়ে চলে গেল। জানলার পাশে দু একজন যাত্রী একটু ঝুঁকে কাঞ্চনদের দেখল।...গাড়িটা দক্ষিণে ঘুরল।... কাঞ্চন এতক্ষণে অনুভব করল চৌরাস্তার ভিড়ে ঘোড়ার গাড়িতে বসে থাকতে সে অত্যন্ত কমপ্লেক্স বোধ করছিল।

আর বৃষ্টি নামল। রেখা বাইরে হাত পেতে ধরল। ফোঁটা ফোঁটা জলে হাতটা অপরূপ হয়ে উঠল। আঙুলগুলিতে একটি মুদ্রার ভঙ্গি। ঘোড়ার ক্ষুরের অলস অথচ অবিচ্ছিন্ন শব্দপ্রবাহে কাঞ্চনের মনে হঠাৎ নূপুরের মৃদু শব্দতরঙ্গের অনুষঙ্গ এল। সারেঙ্গিতে গাঢ় পুরুষালি ছড়ের টানে চন্দ্রকোশ বেজে উঠল।"

এই মন্ত্রমুগ্ধ পরিপার্শ্ব কাঞ্চনের অতিরোমান্টিক অনুভূতির কোণে যে ফাল্গুনী রচনা করে চলেছিল, হঠাৎ তার মগ্নতায় ধাক্কা দিয়ে, সমস্ত সূক্ষ্ম মীড়ের মায়াজালকে নাকচ করে দিয়ে সহসা সহিস হেঁকে বললো :

"বাবু?

কেন?

পর্দাটা ফেলে দিব?

Scanned by CamScanner

কাঞ্চন জানত না এ জাতীয় ফিটনে পর্দা থাকে। অবাক হয়ে বলল 'দাও'। মুহূর্তে যেটাকে ভেবেছিল গাড়ির ছাউনি, তার ওপর থেকে দুপাশে দুটো চামড়ার পর্দা ঝুলে পড়ল। আর হঠাৎ তারা সমস্ত পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।"

অতএব, পুনর্বার স্তব্ধতা ও বিস্ময়। যে নির্জনতা ও নৈকট্য তাদের ন্যায়সঙ্গত পাওনা ছিল এতোদিন, অথচ যা শহর কলকাতার রকমারি ঔৎসুক্য আর তার হৃদয়হীন নিরেট ব্যস্ততা দ্যায় নি, হঠাৎ তা-ই পেয়ে প্রথম বিবাহবার্ষিকীর অন্তরাতে এসে তারা কিছুটা হতবাক হয়ে গেল। কাঞ্চনের আত্মসমালোচক মন এই অবকাশে অকস্মাৎ জানালো :

"রেখাকে নতুন করে কিছুই জানি নি। রেখার শরীর না, মন না, অভ্যাস না। আসলে আমরা দুজনেই আমাদের আমাদের অনেক আকাঙ্ক্ষা পরস্পরের কাছে গোপন করে যাচ্ছি, নিজের কাছে মহৎ থাকার তাড়নায় পরস্পর ছদ্মবেশ পরেছি।"

যে সুস্থ পারিবারিক জীবন পরস্পরকে চেনার স্বাভাবিক সুযোগটুকু করে দ্যায়, কাঞ্চন-রেখার পক্ষে পরস্পরকে নিবিড়ভাবে চেনাজানার সেই সুযোগ ছিল না। কেন ছিল না, কেন সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দেবার সৎসাহস 'সাহিত্যের অধ্যাপকের' ছিল না, কেন রেখার অনমনীয় জেদ প্রেমটুকুকে বিমূর্ত আদর্শের মতো আঁকড়ে ধরে থাকলেও তার স্বাদু সাধ, অথবা সাধু স্বাদকে পেতে চাইবে না? না, গল্পে এই জরুরি প্রশ্নের কোনো বুদ্ধিবিবেচনাগ্রাহ্য সদুত্তর নেই। কেন নেই? মন মন, তোমাদের কী শরীর নেই কাঞ্চন-রেখা?

তবু যে তারা ড্রইংরুমের দম দেওয়া সিন্থেটিক পুতুল নয়, চলমান কোনো প্লেটোনিক থিয়োরি নয়, রক্তমাংসের মানুষ, এই ছোট্ট মুহূর্তের একান্ত আড়ালে তার কিছু পরিচয় ধরা ছিল কাঞ্চনের আকাঙ্ক্ষার ভাষায় :

"ছুঁতে ইচ্ছা করছে। খোঁপাটা খুলে একমুঠো ফুলের মত চুলগুলোকে যদি রেখার মুখে বুকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দি? হাতটা ধরব? কান পেতে রেখার হৃৎপিণ্ডের শব্দ যদি শুনতে পেতাম্? আমার রক্ত আমার মন বৃষ্টি হতে চায়।"

কিন্তু দ্বিধাও আছে। পরাজিতের দ্বিধা নয়, বিজয়ীর দ্বিধা, প্রকৃত পুরুষের স্বাভিমান। যে নারী তার নিজস্ব, তার স্ত্রী, তাকে পেতে চাওয়ার এই কাঙালপনা কি কাঞ্চনের সাজে? কোনো মর্যাদাবান প্রেমিকের সাজে? সুতরাং তার মনে হয় :

"আসলে যৌবন আমাদের লজ্জা, আমাদের যন্ত্রণা। আমি পারি না। আমি পারি না এখানে রেখাকে অপমান করতে।"

কাঞ্চন পারে না এই অন্ধকার নির্জনতার সুযোগ নিতে। রেখা পারে না তার ভীষণ ভালোলাগাকে অযথা ভিখারি বানাতে। কারণ তারা তো সত্যি সত্যি ভালোবাসে পরস্পরকে। সময় ছেনতাই করা এই ব্যতিক্রমী সুখটুকুকে তাই গলায় বরণমালা করে পরে নিতে চায় রেখা, সম্পর্কের স্বীকৃতি যেন, আর কিছু নয়, বেয়াদপ আদর না, কারণ কামনাকে লালসায় বদলে নিতে তার, তাদের রুচিতে বাঁধে। যা দামি, তাকে মূল্যহীন করেনি তারা। অথচ সময় আর সড়ক তো থেমে থাকে না। গন্তব্য এসে যায়।

"গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল। গাড়োয়ান ডাকল—বাবু?

কী?